বিয়ে-বাড়ি

বিয়ে-বাড়ি

('প্রীতি-উপহার' সেট রেকর্ডের কথা ও গাথা)

[১]

ভোর থেকেই শানাই-এর করুণ অথচ মধুর তান উৎসবের সূচনা জানিয়ে দিচ্ছে।

বাঙালি ঘরের বিয়ে-বাড়ি।

শুরু হয়েছে লোকজনের আনাগোনা, হাঁক-ডাক, ব্যস্ততা। ছাদে টাঙানো হলো শামিয়ানার মণ্ডপ, দুয়ারে সাজানো হলো নব-পল্লব। দলে দলে আসছে নিমন্ত্রিত অভ্যাগত—চলেছে অভ্যর্থনা আর অভিনন্দন। চাকর-বাকরদের বিশ্রাম নেই, ঘন ঘন আসছে ডিবে-ভরা পান আর কল্‌কে-ভরা সুগন্ধি তামাক। বাড়িতে এসেছে নববধূ, তাই বধূ বরণের জন্য এত আয়োজন, এত সমারোহ।

গৃহস্বামী অর্থাৎ বরের বাপকে আপনারা অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারেন। মোটাসোটা নধর দেহ, পরিপুষ্ট ভুঁড়ি আর প্রশস্ত টাক। তাঁর ভুঁড়ির পরিধি দেখেই মনে হয়, তাকিয়া ঠেস দেওয়া অভ্যাস, আর টাক দেখে আপনারা নিশ্চয়ই চিনেছেন, ইনি টাকাওয়ালা লোক।

বাড়ির কর্তা তিনি, সুতরাং কাজ আর কথার ভিড়ে তাঁর আর অবকাশ নেই। গায়ের গেঞ্জি তাঁর ঘামে ভিজে গেছে, কাঁধে একখানা তোয়ালে, কোঁচাটি গুটানো।

এই দেখা গেল, চোখে চশমা এঁটে পেন্সিল হাতে তিনি বাজারের ফর্দ দেখছেন, পরক্ষণেই দেখতে পাবেন, অমায়িক হেসে বিনয়-নম্র কণ্ঠে নবাগত কোনো অভ্যাগতকে বলছেন—'আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার ...' সে কথা অসমাপ্ত রেখেই আবার হয়তো তিনি চিৎকার করতে করতে অন্দরের দিকে ছুটলেন—'ওরে রামা, তামাক দিয়ে গেলি না এখনো ...'

অন্দরে তখন নতুন বৌকে ঘিরে মেয়ে মজলিস বসেছে এবং সেই মজলিস সরগরম করে তুলেছেন বরের মা।

বনিয়াদী পরিবারের গিন্নি, গৌরাঙ্গী, চেহারায় স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতায় লাবণ্য।

বয়স একটু হয়েছে বৈ কি—চল্লিশের কাছাকাছি, তবু অস্তমিত যৌবনের শেষ আভাটুকু এখনো উজ্জ্বল করে রেখেছে তাঁর দেহ। গরদের শাড়ির চওড়া লাল-পাড়ের নীচে আয়ত দুটি চোখের তারায় আর পানে-রাঙা ঠোঁটের কিনারে প্রফুল্লতা টলটল করছে।

পাড়ার মেয়েদের তিনি হেসে বৌ দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু অদূরে যে তাঁর নতুন বেয়াই এসে দাঁড়িয়েছেন, সেদিকে এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি।

নতুন বেয়াই মৃদু হেসে সেখান থেকেই দাঁড়িয়ে ডাকলেন—

'বেয়ান! বলি ও বেয়ান!

আলাপের যে ফুরসৎই নেই, এসো, এসো, এসো বেয়ান।

(আহা) বেয়ান যেন জিয়ান রসের কড়া-পাকের ভিয়ান!'

কিন্তু কথায় হটবার পাত্রী বেয়ান নন। ঘোমটাখানি কপালের নিচে আর একটু নামিয়ে দিয়ে বেয়ান জনান্তিকে বললেন—

'রসের কথা কে বলে ও? ময়রা মিনসে বুঝি?'

তারপর যেন নিতান্তই অপ্রস্তুত হয়েছে, এই ভাব দেখিয়ে বললেন—

'কে ও? বেয়াই? মাফ করো ভাই,

গরু-খোঁজা করে আমি তোমায় ফিরছি খুঁজি!'

এই সময়ে বাইরে থেকে ব্যস্ত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—

'ওগো গিন্নি, আরে, গিন্নি কোথায় গো?'

বরের বাপ অন্দর-মহলে ঢুকেই থমকে দাড়িয়ে গিন্নিকে বললেন—

'ও, বেয়াই-এর সঙ্গে ভিড়ে গেছ বুঝি?'

কিন্তু রসিকতায় তিনিও কম যান না। উভয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে বলে উঠলেন—

'আহা, এরা যেন রাধাকেষ্ট, আমি মাঝে আয়ান।'

মেয়ের বাপ উকিল, কথার ব্যবসা করেন। কিন্তু তবু আজ নতুন-পাওয়া সুরসিক বেয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে, কড়া হাকিমের সুমুখে কাঁচা-উকিলের মতোই তাঁর কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি তিনি নতুন বেয়াইকে বললেন—

'বেয়াই, হাবাগোবা, গোবেচারি দেখতে মোদের এ বেয়ান,

কিন্তু কথায় হার মেনে যায় গুপ্তিপাড়ার ঘোড়েল শেয়ান।'

বেয়ানও এর পাল্টা দিলেন—

'বেয়াই, তুমি জানো-য়ার লোক, অর্থাৎ জানো অনেক কিছু,

ল্যাজের মতন উপাধিও ঝুলছে নামের পিছু!

আমরা মুখখু-সুখখু পাড়াগেঁয়ে, নেই তো তেমন বুদ্ধিগেয়ান।'

বরের বাপ দেখলেন রসালাপ জমে উঠেছে মন্দ নয়। কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি বললেন—

'দুই বেয়ান না থাকলে বেয়াই রস জমে না ভালো।'

মেয়ের বাপ এবার একটু লজ্জিত হয়ে চাপা গলায় বললেন—

'আমার গিন্নি? আরে রাম! কদা, কুচ্ছিৎ, কালো।'

কথাটা কিন্তু নতুন বেয়ানেরও কানে গিয়েছিল। খোসামোদপ্রিয়তার দিক থেকে মেয়েদের সঙ্গে অপিসের বড়বাবুদের তুলনা করা যেতে পারে। এক বেয়ানের নিন্দা করা

মানেই আর এক বেয়ানের স্তুতিবাদ। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব ধরা পড়ে এইখানেই। নতুন বেয়ান মনে মনে খুশি হয়ে বেয়াইকে বললেন—

'খাসা তোমার মুখ মিষ্টি,
কথা ত নয়, সুধাবৃষ্টি।'

বরের বাপ দরাজ হাসির শব্দে অন্দর-মহল মুখরিত করে বলে উঠলেন—

'কারণ, তুমি বর্তমানে বেই-মশায়ের খেয়ান॥'

[২]

নিশীথ-রাত্রি!

ফুল-শয্যার কাজ চুকে গেছে, থেমেছে কোলাহল, শঙ্খ আর উলুধ্বনি। উৎসবের বাতি এসেছে স্তিমিত হয়ে। সারা বাড়িটার চোখে এখন শ্রান্তির তন্দ্রা। নিরালা ঘরে পুষ্প-শয্যায় বর আর বধূ বসে।

বাসর-রাতে প্রথম পরিচয়ের অবসর ছিল না। শ্যালিকা আর সখিদের হাসি, গান, কৌতুক-আলাপনের মাঝে তাদের দু'জনের ভিরু কথা গিয়েছিল হারিয়ে।

কিন্তু আজ এসেছে চুপি-চুপি কথা কইবার লগ্ন, পরস্পরকে পেয়েছেও একান্ত নিকটে। জীবনের এই মিলন-মদির সৌরভ-সুন্দর রাত্রিটি কি এমনি নীরবেই কেটে যাবে? তাই দু'জনের চোখে নেই আজ ঘুম!

ফিকে-নীল বাতির আলোয় নব-বধূর লাজ-রক্তিম চন্দন-পরা মুখের পানে তাকিয়ে বর ভাবছিলো, মালা-বদলের রাত্রি আজ, কিন্তু কোন ফুলের মালা এই রূপের প্রতিমার কণ্ঠে মানাবে? বধূকেই সে শুধালে—

'কোন ফুলেরি মালা দিই তোমার গলে লো প্রিয়া?'

বনে বনে ফুলের ছোঁয়ায় বুলবুল পাখি যেমন গান গেয়ে ওঠে, তেমনি আমারও মনের—

'বুলবুল গাহিয়া ওঠে তব ফুলের পরশ নিয়া।'

বধূ ধীরে ধীরে জবাব দিলে—

'হাতে দিও হেনার গুছি, কেশে শিরীষ ফুল,
কর্ণে দিও টগর-কুঁড়ি অপরাজিতার দুল।
কুন্দ-কলির মালা দিও, না-ই পেলে বকুল,

কিন্তু কি হবে শুধু ফুল নিয়ে? রাতের ফুল যে ভোরের আগেই ঝরে যায়, তাই বধূর কণ্ঠে মৃদু-মিনতি বেজে উঠল—

'ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল।'

বর তখন বাহু-বেষ্টনে বধূকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'ফুলের মালা তো দিলাম। কিন্তু—

'কোন ভূষণে রাণী ও রূপের করি আরতি?
হয় সোনার বরণ মলিন, হেরি তোমার রূপের জ্যোতি!'

আবেশ-মধুর-কণ্ঠে বধূ চুপি-চুপি বললে—

'চাইনে আমি স্বর্ণ-ভূষণ—
তোমার বাহুর-বাঁধন প্রিয় সেই তো গলার হার,
হাতে দিও মিলন-রাখী, খুলবে না যা আর।'

এমন নিরালা রাত যে কানে-কানে কথা কইবার জন্যেই এসেছে। না-ই বা দিলে কানে হীরার দুল,—

'কানে দিও কানে-কানে কথার দুটি দুল,
নিত্য নূতন ভূষণ দিও প্রেমের কামনার।'

বধূর আনত মুখখানি তুলে ধরে বর বললে, 'হৃদয় তো' তোমাকে দিয়েছি, সাজিয়েছি প্রেমের কামনার নব-ভূষণ দিয়ে। কিন্তু কানে-কানে কথা কইবার সময় কি বলে তোমায় ডাকবো বলো তো? কোন নামে বোঝাব তুমি আমার কে? কপালে চন্দন, সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় রাঙা চেলীর ঘোমটা—তোমার এই চির-নূতন রূপ দেখে কি তোমার পুরানো নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে? বলো—

'কোন নামেতে ডাকি, সাধ না মেটে কোনো নামে,
তব নাম-গানে সব কবি হার মানে ধরাধামে।'

বধূ বললে—

'সুখের দিনে সখী বলো, সেই তো মধুর নাম
দুখের দিনে বন্ধু বলে ডেকো অবিরাম।'

'আমি তো শুধু বাসর-সঙ্গিনী হয়ে আসিনি, জীবনের আনন্দ-বেদনায় তোমার পাশে চিরকাল আছি। সুখের উৎসবে তোমার সখী হবো, তোমার হাসি দেখে আমার মুখে হাসি ফুটবে, আর দুঃখে বন্ধু হয়ে দেবো সান্ত্বনা, তোমার চোখের জলে আমারও চোখের জল মিশবে। আর এমন নিরালা রাত্রে যখন বাইরে জাগবে শুধু চাঁদ, আর ঘরে তুমি আমি, সেই—

'নিরালাতে রাণী বলো শ্রাবণ-অভিরাম।'

তারপর?—

ভীরু-কপোতীর মতো লজ্জানত মুখখানি স্বামীর বুকে লুকিয়ে বধূ চুপি চুপি বললে—

'বুকে চেপে প্রিয়া বলো, সেই তো আমার নাম।'

[৩]

মিলন-রাত্রি মানুষের স্বপ্নের মতো ক্ষণস্থায়ী,—গ্রীষ্মকালের দিনে যেন আধ-গেলাস জল! পান করতে না করতেই ফুরিয়ে যায়, থাকে শুধু পিপাসা!

ফুল-শয্যার রাত্রিও ভোর হলো।

চুপি চুপি দরজা খুলে, বাসি-ফুলের বিছানা থেকে নতুন বৌ উঠে বাইরে এসেছে। জাগর-ক্লান্ত চোখে এখনো অলস-আবেশ, ঠোঁটে এখনো রাঙা মদিরতা,—কিন্তু সারা দেহে লজ্জা, মুখে অবগুণ্ঠন।

'পিছন থেকে কে বলে উঠলো,

'চাও চাও চাও নববধূ অবগুণ্ঠন খোলো,

আনত নয়ন তোলো।'

কে এলো? কে এলো দক্ষিণের হাওয়ার মতো চঞ্চল উচ্ছ্বাসে, খরস্রোতা নদীর মতো কল্লোল তুলে?

পেছনের মানুষটি এবার বধূর সামনে এসে বললে,—

'সই, আমি যে ননদী! খরতর নদী, লজ্জা কি?'

ননদ এসেছে ভাব করতে,—নতুন বৌ-য়েরই সমবয়সী।

বৌ তবু ঘোমটা খোলে না, লজ্জায় মুখ নামিয়ে বসে বসে শুধু আঙুলে জড়ায় আঁচল।

ননদী কিন্তু সত্যিই 'খরতর নদী'। এতো সহজে সে বৌকে রেহাই দেবে কেন? কাল রাতে বন্ধ-ঘরের দরজার বাইরে তাদেরই দু'জনের সঙ্গে আর একটি কৌতূহলী প্রাণী যে জেগেছিল, শুনেছিল কানে-কানে কথা, দেখেছিল প্রাণে-প্রাণে আলাপ, বৌ তো আর তা জানে না।

চোখের কোণে কৌতুকের বিদ্যুৎ আর ঠোঁটের কিনারে দুষ্টু হাসির তীক্ষ্ণ তীর ঝিকমিকিয়ে ননদ বললে—

'লজ্জায় ফুল-শয্যায় কাল ছিল না তো নত ঐ আঁখি!

সবই বলে দেবো' যদি বৌ কথা না বলো'

এই শাসনবাণী শুনে বেচারী নতুন বৌয়ের নতমুখ আরো নত হয়ে পড়ল। গত রাতের গোপনতা ননদের কাছে তা হলে ধরা পড়ে গেছে? ছিঃ ছিঃ! কিন্তু ননদীর মনের সঙ্গী-হারা পাখি তখন মিনতি-ভরা সুরে গাইছে,—'বৌ কথা কও'! বধূর চিবুক ধরে মুখখানি তুলে সে বললে—

'বউ কথা কও ডাকে পাখি

তবুও নীরব রবে নাকি?'

হঠাৎ ননদের চোখে পড়ে গেল, বধূর গালে কার অনুরাগ এখনো রাঙা হয়ে আছে। কৌতূহল—ভরে সে বলে উঠলো,

'দেখি, দেখি গালে লালী ও কিসের?'

তারপর মুখ টিপে হেসে বললে—

'ও! লজ্জায় বুঝি লাল হলো?'

ননদীর পরিহাস-বাণে জর্জরিতা হয়ে নিরুপায় বৌ তখন উঠে ত্রস্ত পদে পাশের ঘরে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে, নূপুর উঠলো রুণঝুনিয়ে। কিন্তু ননদ তবু পিছু ছাড়ে না। পলাতকা বধূর আঁচল ধরে বললে—

'ও কি, অধীর-চরণে যেয়ো না যেয়ো না
আনঘরে লুকাইতে দেখে যদি কেউ?
সখি, পাশের ও-ঘরে মানুষ যে রহে
তারও অন্তরে বহে বিরহের ঢেউ!'

সুতরাং, পালানো আর হলো না। পাশের ঘরে রয়েছে বর। এই দিনের বেলায় গত রাত্রির মিলন-স্মৃতি তারো বুকে তো বিরহের ঢেউ তুলেছে। যার জন্যে এত লজ্জা, বৌ কি লজ্জার মাথা খেয়ে তারই ঘরে গিয়ে লুকাতে পারে?

লজ্জা বাঙালির ঘরের বৌদের অলঙ্কার।

কিন্তু ননদ যেন বনের চপল কুরঙ্গী, বৌ তো সে নিজেও, তবু এতোখানি লজ্জার ধার সে ধারে না।

এত সাধাসাধির পরেও বৌ যখন না খুললে ঘোমটা, বা না কইলে কথা, তখন সে বললে—

'লজ্জাই যদি তব ভূষণ
সজ্জায় তবে কি প্রয়োজন?'

তারপর জোর করে বধূর ঘোমটা খুলে দিয়ে, বন্ধুর মতো সামনে এগিয়ে এসে স্নিগ্ধ হেসে বললে,

'ওরে ও সুখে সুখি হব, দুখে দুখি
বোসো মুখোমুখি, লাজ ভোলো।'

[৪]

চারু-দর্শনা এই দুরন্ত মেয়েটির ঔরাত্ম্যে লজ্জা করবার আর উপায় কই? বধূ তখন আনত-মুখ তুলে বললে—

'হার মানি ননদিনী—
মুখর-মুখের বাণী শুনি তোর
লজ্জাও লাজ সখি ভোলে,
পুলকে প্রাণ-মন দোলে।'

হার মেনে বৌ ননদের সঙ্গে করলে সন্ধি। দুই সখিতে হলো ভাব, শুরু হলো আলাপ।

ননদ শুধালে, 'এতো লজ্জা কেন ভাই তোমার?'

কেন লজ্জা, বৌ কি নিজেই তা জানে?

শুভ-দৃষ্টির সময় সেই যে চোখের পলকে চোখে-চোখে চাওয়া, তারপর থেকেই তার আঁখিপাতা ক্ষণে ক্ষণে অকারণে নুয়ে আসে,—কতো কথা বলতে মন হয়ে ওঠে ব্যাকুল, মুখে তবু ফোটে না কথা! সে বুঝতে পারে না, কে তাকে এতো লজ্জা দেয়—প্রথম পুরুষ, না প্রথম প্রেম?'

ননদের কানে-কানে বৌ চুপি চুপি জবাব দিলে—

'পলকের চাহনিতে কে জানে কেমনে
প্রাণে এলো এতো মধু, এতো লাজ নয়নে!
বাহিরে নীরব কথার কুহু
অন্তরে মুহু মুহু বোলে।'

অথচ, এতদিন তো সে এমন লাজুক ছিল না। তার কুমারী-মন আকাশের পাখির মতো গান গেয়ে উড়ে বেড়াত, লাজের মানা মানত না। বৌ বলতে লাগল—

'তোরই মতো ছিনু সই বনের কুরঙ্গী,
মানি নাই কোনো দিন লাজের ভ্রূভঙ্গী।'

কিন্তু এখন আমি যে বৌ।

তবু, মুখরা-বেহায়া ননদীর শাসনে বারে বারে বধূর লজ্জা টুটে যায়!

এবার বধূর পরিহাসের পালা।

ননদের গলা জড়িয়ে মৃদু হেসে সে বললে, 'কথায় তোর সাথে পারবার জো নেই ভাই ঠাকুর-ঝি! কিন্তু কথায় তোর এত ধার কেন বল তো?

'মধুয়া-মুখরা ওলো মিষ্টি-মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর-জামাই চোর?'

ননদী তখন কপট রোষে বধূর গালে ঠোনা মারলে।

কিন্তু নব-পরিচিতা এই মুখরা কৌতুকময়ী মেয়েটিকে বৌ ভালোবেসে ফেলেছে, সমস্ত অপরিচয়ের বেড়া ভেঙ্গে সখি হয়ে যে কাছে এলো, তার কাছে লজ্জা কিসের?

হেসে গুণ্ঠনহীনা বধূ বললে—

'তব অভিনব বাণী হিলোলে
গুণ্ঠন আপনি খোলে।'

[৫]

ঘুমন্ত বাড়ি জাগল, আবার শুরু হলো দিনের কলরব।

সারা বাড়ি আনন্দে মেতে উঠল। দুটি মানুষের মিলনকে কেন্দ্র করে যে রঙিন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে আরো অনেকেরই মনে লেগেছে রোম্যান্সের রঙ। শুধু শিক্ষিত এবং অভিজাত নয়, যারা অশিক্ষিত গরীব, তাদেরও মন বিয়ে-বাড়ির এই আনন্দ-হিল্লোলে অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বরের বাড়ির চাকর গোবিন্দের আজ এক মিনিটিও ফুরসৎ নেই ; ভোর থেকেই হাজার কাজে সে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিন হলে এত ফরমাস তামিল করতে গোবিন্দ নিশ্চয়ই ঘোরতর আপত্তি জানাত, কিন্তু আজ তার যেন ক্লান্তি নেই। আজ তার উৎসাহের উৎস গেছে খুলে, কাজ করতে করতে তার গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে !

গোবিন্দের এই সানন্দ উৎসাহের মূলে, অবশ্য মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, একটি গূঢ় কারণ আছে। পাশ দিয়ে কেউ এসেন্স মেখে চলে গেলে, সেই সুগন্ধের ক্ষীণ আভাসে যেমন কিছুক্ষণের জন্যে লোকের নেশা ধরে, তেমনি দুটি মানুষের মদির-মিলন স্মরণ করে গোবিন্দেরও মনে লেগেছে নেশা।

এতো কাজের ভিড়েও সে মনে মনে এরই মধ্যে তার দোসর খুঁজে নিয়েছে। তাকে হয়তো আপনারা লক্ষ্য করেন নি, কিন্তু গোবিন্দের দৃষ্টি তার প্রতি অনুক্ষণ সজাগ।

সে বিন্দে, কনে-বাড়ির ঝি, নতুন বৌ-এর সঙ্গে এসেছে। আঁট-সাঁট গড়ন, পরণে খড়কে-ডুরে শাড়ি, মাথায় চূড়ো-খোপা, কপালে উল্কি এবং মুখে পান দোক্তা আর ধারালো হাসি।

অতি সাধারণ এই মেয়েটার কাছে নিজেকে খেলো করতে অন্য সময়ে অশিক্ষিত গোবিন্দের আত্মাভিমানে হয়তো ঘা লাগতো কিন্তু আজকের দিনে এহেন বিন্দে, গোবিন্দর চোখে একটি বিশেষ রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে, তাই দুটো কথা কইবার অছিলায় সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে বিন্দের আশে-পাশে।

অনেক বেলায় বিয়ে-বাড়ির হাঙ্গামা যখন একটু থামলো, নিরিবিলি অবসর পেয়ে গোবিন্দ এসেছে সদর ছেড়ে খিড়কির রোয়াকে—বিন্দের সঙ্গে ফের আলাপ করতে।

কাঁধের গামছাখানা দিয়ে মুখের ঘাম চট করে একবার মুছে নিয়ে গোবিন্দ ডাকলে, 'শুনতিছ ! ও বিন্দে ! ও কনে বাড়ির ঝি ! এ্যাঃ, কথাটা মোটেই কানে যাচ্ছে না ! বলি একবার ফিরে চাইয়েই দ্যাখো !

ও বিন্দে ! ঘাড় ফিরোয়ে চাও তোমার ঐ চোখ মেলে।
সত্যি বলতিছি, তুমি সগ্যে যাবা আমার মতন লোক পেলে ?

কিন্তু বিন্দের আজ গুমোর বেড়েছে, অত সহজে সে আলাপ কর্তে চায় না। মুখ-ঝামটা দিয়ে সে বলে উঠলো—

'তুই বরের বাড়ির চাকর সেই সম্পর্কে বেহাই
তাই পেলি আজ রেহাই।
নইলে পোড়ার মুখে দিতাম ঢেলে বাসি-আকার ছাই॥'

গোবিন্দ বেচারি একটু থতমত খেয়ে এক গাল হেসে বললে—

'কেডা কলো বিন্দে মোগো সম্পর্ক নাই ?
আমি তোমার ননদের যে একমাত্র ভাই।'
তাকি ভুলে গেলে ?

নাঃ, লোকটা নেহাৎই নাছোড়বান্দা ! চোটে উঠে বিন্দে বললে—

'মর মিনসে, সয় না সবুর হাড়-জ্বালাতে ফের এলে।'

কিন্তু মায়াও হচ্ছিল বিন্দের। মুখের দুটো মিষ্টি-কথার প্রত্যাশায় যে এমন করে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আজ সে নাই বা ফিরিয়ে দিল? আর, বিয়ে-বাড়ির এই হাসি-খুশির রঙ কি বিন্দের যৌবনকেও একটু রঙিন করে তোলেনি? গোবিন্দের কাঙাল-চোখ আর ঘর্মাক্ত মুখের পানে তাকিয়ে সে গলাটা কোমল করে বললে—

'ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে বিরহেরি বোঝা ঠেলে
একটু দাওয়ায় বোসো'—

গোবিন্দ খুশি হয়ে বলে উঠলো—

'বাতাস করবা নাকি?'

বিন্দে এবার হেসে ফেলে বললে—

'আঃ চুপ, চুপ করে ঐ দাওয়ায় বোসো
হাওয়ায় মাথা ঠাণ্ডা হবে, ঐ দাওয়া বোসো
প্রেম-পাগলের দাওয়াই যে ঐ—'

এদিক-ওদিক চেয়ে বিন্দে গোবিন্দের হাত ধরে তাকে রোয়াকে বসিয়ে দিল। গোবিন্দের খুশির আর সীমা নেই। আকর্ণ দন্ত-বিকাশ করে সে বলে উঠলো—

'আজ হ্যাঁকোচ-প্যাঁকোচ করতিছে প্রাণ পুলকের-ই
ঠেলায়।'

বিন্দে ভাবলে আনন্দ তো শুধু সেই দুটি মানুষেরই, যারা পরস্পরকে ভালোবেসে কাছে পেয়েছে আর নিরিবিলি ঘরে ফুল-ছড়ানো বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে সারারাত মনের কথা কয়েছে। বাঁকা চোখে চেয়ে, ঠোঁটে হাসির ইশারা ফুটিয়ে সে বললে—

'আর, এক-যাত্রায় পৃথক ফল আমাদেরই বেলায়।'

কিন্তু ঝি-চাকর হলেও তাদের মন বলে কি কিছু নেই? চারিদিকের এই আনন্দ-সমারোহের মাঝে তাদেরও যৌবন-ও কি গান গেয়ে উঠতে চায় না? বিন্দে ডুরে-শাড়ি আঁচল দুলিয়ে, চূড়ো-খোঁপা হেলিয়ে বলে উঠলো—

'মোরা গিলবো অঢেল আনন্দ আজ একটু ছাড়া পেলে'

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি একটা উপমা দিলে—

'যেমন দুর্ভিক্ষেরই দেশের মানুষ গো-গেরাসে গেলে॥'

[৬]

আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ, আর দীঘিতে ফুটেছে কুমুদী।

ঘরে বর আর বধূ। দুটি জীবন-স্রোত এসে মিলেছে প্রেমের তীর্থে। একটি প্রাণের সাথে মিলেছে আর একটি প্রাণের ছন্দ! জন্ম নিল তাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কবিতা!

জীবনের এই পরিপূর্ণতার লগ্নে বর আর বধূ একত্রে কণ্ঠ মিলিয়ে বললে—

'মোরা ছিলাম একা, আজ মিলিনু দুজন।
পাপিয়ার পিয়া-বোল কপোত কূজন॥'

এ মিলন যেন পাপিয়ার 'পিয়া' ডাক, আর কপোত-কপোতীর কূজনের মতোই মধুর, সম্পূর্ণ! দুজনের এই মিলন এ যেন পরস্পরের কাছে পরস্পরের আবির্ভাব! বর যেন এতদিন ছিল উষর প্রান্তরের মতো নিঃসঙ্গ, সেখানে সহসা এলো শ্যামলতার বন্যা, ফুটলো ফুল! বর তাই বললে—

'তুমি সবুজের স্রোত এলে উষর দেশে।'

আর স্বামী নারীর জীবনে পরম আশির্বাদ! বধূর লাজ-মৃদু কণ্ঠে সেই পরম সার্থকতার ভাষাই ফুটলো—

'তুমি বিধাতার-বর এলে বরের বেশে।'

বধূর সীমন্তিনী কঙ্কণ-পরা কল্যাণী-মূর্তির পানে চেয়ে বর বললে—'তুমি তো' শুধু 'বউ' নও—

'তুমি গৃহে কল্যাণ'

বঁধু তেমনি নম্র-কণ্ঠে বললে,—'তুমিও ত' শুধু আমার প্রতিদিনের জীবনের, সংসারের স্বামী নও। তোমার প্রেমের পূজায় আমি যে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। তুমি যে আমার দেহ-মনের স্বামী!

'তুমি প্রভু মম ধ্যান।'

বাইরে চাঁদ আর কুমুদী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। জীবনের সঙ্গে জীবনের, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলনে আকাশ-ধরণী তাদের চোখে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে!

ঘরের ভিতর দুটি তরুণ-কণ্ঠে সেই কথাই বেজে উঠলো—

'সুন্দরতর হলো সুন্দর ত্রিভুবন।'

* * *

এইবার আশির্বাদের পালা। পুরনারীদের কলগুঞ্জন শোনা গেল। গুরুজনেরা এসেছেন এই মিলনকে আশির্বাদ করতে। প্রথমে এলেন ঠানদি। পাকা আমের মতো টসটসে চেহারা, মাথার পাকা চুলে অন্তরের শুভ্র প্রসন্নতা প্রকাশ পেয়েছে, মুখে বার্ধক্যের রেখা।

ঠানদির বয়সের হিসেব নেই, কিন্তু মন আজো আছে সেই বাইশ বছরের কোঠায়। মিষ্টি হেসে ঠানদি নবদম্পতির সামনে এসে বললেন—

'ভাই নাত-জামাই!
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—
তুমি বৌর-তীর্থে নেড়া হও।
মোর নাতনীর ভ্যাড়া হও।

বাইরে গোঁফে চাড়া দেবে
ঘরে বৌ-এর ঘোড়া হও।
ফোঁসফোঁসাবে বাইরে শুধু
বৌ-এর কাছে ঢোঁড়া হও।
বাইরে পুরুষ অটল পাষাণ
বৌ-এর ঘরে নোড়া হও।
দিনের বেলা ফরফরাবে
রাত্তির বেলা খোঁড়া হও।
সূর্য্য-চাঁদের আয়ু পেয়ে
চিরকালটা ছোঁড়া রও।
নাতনীর আমার ভ্যাড়া হও,
ন্যাড়া হও॥

কার আজ্ঞে? না কামরূপ কামাখ্যা-দেবীর আজ্ঞে॥

ঠানদির পরে এলেন মা ধান-দূর্বা নিয়ে। বাঙালি-ঘরের নারীর যা চিরন্তন কামনা, যা চিরকালের আদর্শ, তারই কথা তিনি তাঁর ঘরের লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। অন্তরের মধুর মমতা তাঁর কণ্ঠ হতে ঝরে পড়তে লাগল—

'তুমি হও মা চির-আয়ুষ্মতী
সাবিত্রী সমান সতী।
অচঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে
চিরকাল এই ঘরে রও,
শ্বশুর শাশুড়ীর আদরিণী
স্বামীর সুয়োরাণী হও।
তোমায় পেয়ে বিধির বরে
যেন এ ঘর ধনে-জনে ভরে।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
রাখবে দেহ গঙ্গাজলে।
সিঁথেয় সিঁদুর মুখে পান
আলতা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান॥

এরপর আশীর্বাদ করতে এলেন দিদি। তাঁর নতুন বোনটির চিবুক ধরে তিনি স্নেহ-স্নিগ্ধ সুরে বললেন—

'তুমি বৌ শুধু নও, ঘরের আলো,
এই আলোতে মোদের ঘরের
কেটে যাবে আঁধার কালো
রাঙা হাতে শাদা শাঁখা

অন্নপূর্ণার আশীষ মাখা
ক্ষয় যেন না হয় ও-হাতে
অম্লান থাক সিঁদুর সাথে
এই চাই ভাই, ঘরে পরে
পড়বে সবার সুনজরে।
আলতা সিঁদুর নোয়া পরে
থাক তিন কুল আলো করে।
জানবে না ক দুঃখ শোক
অন্তে পাবে স্বর্গ-লোক॥'

তারপর বাজল মঙ্গল-শঙ্খ, পুরনারীরা দিল উলুধ্বনি, আর আকাশের দিব্যলোক বিধাতার প্রসন্ন আশীর্বাদ হয়ে মাটির বুকে নেমে এলো।

'বিয়ে=বাড়ি' শীর্ষক এই গ্রামোফোন রেকর্ড-নাটকের ('হিজ মাস্টার্স ভয়েস, কোম্পানীর রেকর্ড নম্বর N7326 to N7328 দ্রষ্টব্য) গানগুলোর অধিকাংশই নজরুলের 'সন্ধ্যামালতী' শীর্ষক গীতিগ্রন্থে সংকলিত।